ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সমীপে দরদমাখা আহবান

তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও!

তৃতীয় পর্ব

‘গণতান্ত্রিক রাজনীতি দ্বীনি ভাইদের ক্ষমতায়নের কারণ নাকি দুর্বলতার কারণ?!!

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ

ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সমীপে দরদমাখা আহবান

তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও!

তৃতীয় পর্ব

‘গনতান্ত্রিক রাজনীতি দ্বীনি ভাইদের

ক্ষমতায়নের কারণ নাকি দুর্বলতার কারণ?!!’

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ

AN-NASR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد...

হামদ ও সালাতের পর-

পাকিস্তানে বসবাসরত আমার দ্বীন প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা!

গণতন্ত্রে আমাদের দ্বীনি ভাইদের অংশগ্রহন তাদের শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়েছে নাকি তাদের দুর্বলতার কারণ হয়েছে? দ্বিতীয়ত: কোন সিস্টেম কি গণতন্ত্রের মাধ্যমে পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব? এ দুটি বিষয়ের উপর এই পর্বে আলোচনা করা হবে, ইনশা আল্লাহ। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে ও নেক আমলের দিকে পথপ্রদর্শন করুন।...আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

আমাদের দ্বীনি রাজনৈতিক দলগুলোর একটি দৃষ্টিভঙ্গি হলো: নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতি তাদেরকে শক্তিশালী করেছে। এক্ষেত্রে তারা যুক্তি দিয়ে থাকে যে, এখানে যদি প্রস্তাবনামূলক দাবী গৃহীত হয়ে থাকে, কাদিয়ানীদেরকে কাফির ঘোষণা করা হয়ে থাকে এবং ১৯৭৩ সালের সংবিধান অস্তিত্বে এসে থাকে; যার কারণে আল্লাহ তা'আলার হাকিমিয়্যাতের/ আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের স্বীকারোক্তি দেয়া হয়েছে এবং নিশ্চিত বিশ্বাস প্রদান করা হয়েছে যে, এখানে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না, তাহলে এই সব কীর্তিকলাপ নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতির-ই ফলাফল বা সারাংশ।

আমরা (মুজাহিদীন) মনে করি- প্রথমত: এগুলো কোন কীর্তিমূলক কর্মকান্ড-ই না। বরং তা এই প্রতারণাপূর্ণ সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে একটি প্রদর্শনীমূলক পদক্ষেপ মাত্র। কারণ, এই সকল পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও আমরা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দিকে এক কদমও সামনে বাড়তে পারেনি বরং বাস্তবিকপক্ষে আমরা যেখান থেকে সফর শুরু করেছিলাম সেখান থেকে আরো অনেক অনেক দূরে অবস্থান করছি। তার কারণ কি...? তার কারণ হলো: পাকিস্তানের ইতিহাস এবং তার বর্তমান পরিস্থিতি এ কথার উপর সাক্ষী যে, এই সকল পদক্ষেপ নেওয়ার কারণে দ্বীনদারদের শক্তিমত্তায় পৃথকীকরল করা হয়েছে। তাদেরকে গণতান্ত্রিক শ্লোগানের মাঝে ফাঁসানো হয়েছে। যার কারণে তারা বর্তমানে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করণের ময়দানে সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াবিহীন অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে বাতিলদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব আগের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ!

আমরা প্রথমে এই সকল পদক্ষেপসমূহের প্রদর্শনীর ব্যাপারে আলোকপাত করতে চাই। আপনি যদি প্রস্তাবনামূলক দাবি গৃহীত হওয়ার কপি সামনে রাখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তাতে বলা হয়েছে: হাকিমিয়্যাত তথা আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং কুরআর ও সুন্নাহর বিপরীতে কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না। কিন্তু ১৯৫২, ১৯৬২ ও ১৯৭৩ সালে সংবিধান প্রণয়ন করার সময় এবং পরবর্তীতে তাতে সংশোধনী করার সময়কালেও কুরআন ও সুন্নাহর আইনের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। বরং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

আবার কোথাও কোথাও কিছু ধারা গোপনীয়ভাবে এমনভাবে প্রদান করা হয়েছে, যার কারণে এখানে (পাকিস্তানে) এমন জীবনব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে; যা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সুরক্ষা প্রদান করে এবং ইসলামী ধারাগুলোকে বাস্তবে অকার্যকর করে রাখে। যখন এই দ্বন্দ্বের কারণ জিজ্ঞাসা করা হল, তখন উত্তর পাওয়া গেলো যে...এই প্রস্তাবনামূলক দাবি গৃহীত হওয়া ও ইসলাম বিরোধী ধারাগুলি সব সমান মর্যাদার দাবি রাখে। একটি অপরটিকে নিঃশেষ করতে পারবে না। কোন একটি ধারাও অপর ধারার উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। উভয়টিই পার্লামেন্টের দুই তৃতীয়াংশ লোকের অধিক্য দ্বারা পাশ হয়েছে। আর পার্লামেন্টের দুই তৃতীয়াংশ লোকের আধিক্যপ্রাপ্তদেরই সংবিধান সংশোধনী করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। যেন কোনটি জায়েজ আর কোনটি নাজায়েজ, কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম? এর ফায়সালা পার্লামেন্ট করবে![1] তাছাড়া এখানে আর কোন অর্থ হতে পারে না যে, এখানে আল্লাহ তা'আলার

[1] সাবেক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ফয়সাল রেজা আবিদীকে একটি টিভি সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যদি পার্লামেন্টে আইন পাশ হয় যে, মদ হালাল বা হত্যা করা বৈধ, তাহলে কি মদ ও হত্যা বৈধ হয়ে যাবে? তখন আবেদী উত্তর দিল: "অবশ্যই বৈধ হয়ে যাবে। কারণ, পার্লামেন্ট হলো সুপ্রিম ইনস্টিটিউশন(সংসদ)। তারাই আইন তৈরী করে এবং দেশের সকল আদালত সুপ্রিম কোর্টের অধীনে চলে।"... এটা বলা যদিও চূড়ান্ত পর্যায়ের অদ্ভুত মনে হবে, কিন্তু আমাদের "ইসলামী গণতান্ত্রিক পাকিস্তান"-এর ভিতরে এই নীতিই কার্যকর। প্রকাশ থাকে যে, এটার নামই হলো গণতন্ত্র। ইসলামিক গবেষণা কাউন্সিলের পক্ষ থেকে যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, তা মূলত: ফতোয়া এবং তার উপর আমল করা নি:সন্দেহে ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে। কিন্তু তা পার্লামেন্টের কাছে কেবল পরামর্শ প্রদানের যোগ্যতা রাখে। তাই পার্লামেন্ট ইচ্ছে করলে তা গ্রহন করতে পারে বা তা আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিতে পারে। (আরো বিস্তারিত দেখুন: শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহর " سپیدہ سحر اور ٹمٹماتے چراغ তথা প্রভাতের সূর্যালোক এবং নিস্প্রভ বাতি" নামক কিতাব অথবা মুফতি মুহাম্মাদ ত্বকী উসমানী সাহেবের "نفاذ شریعت ور اس کے مسائل তথা শরয়ী আইন প্রতিষ্ঠা ও তার মাসআলা-মাসায়েল" নামক কিতাব।)

হাকিমিয়্যাত তথা আল্লাহ তা'আলার আইনের কোন কর্তৃত্ব নেই, শরীয়তের কোন কর্তৃত্ব নেই বরং এখানে পার্লামেন্টের দুই তৃতীয়াংশ লোকের কর্তৃত্ব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলিকে মানা ও তা প্রয়োগ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, বলা হবে এগুলো আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি। বরং তার জন্য এসেম্বলী সদস্যদের সন্তুষ্টি আবশ্যক। যদি তাদের স্বীয় কামনা-বাসনার সাথে পুরোপুরিভাবে মিলে যায় এবং তাদের পক্ষ থেকে এই সকল বিধানাবলির সত্যায়নপত্র গৃহিত হয়, তাহলে তো ঠিক আছে। তখন এগুলো আইন হিসাবে পরিগণিত হবে। নতুবা শরীয়তের মুকাবেলায় তথাকথিত পাবলিক প্রতিনিধিদের কামনা-বাসনা এখানে শাসক হবে। কাদিয়ানীদের বিষয়টি লক্ষ্য করুন- কাদিয়ানীরা জিন্দিক। তারা ইসলামের নামে নিজেদের কুফর বিস্তার করে, অথচ শরয়ীভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে থাকার কোন অধিকার তাদের নেই। কিন্তু এখানে (পাকিস্তানে) তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়েছে, পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের অধিকার ঘোষণা করে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষাও প্রদান করা হয়েছে। যার কারণে বর্তমানে তারা নিজেদেরকে ছাড়া সবাইকে কাফির বলে থাকে। সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা অধিষ্ঠিত এবং প্রকাশ্যভাবে নিজেদের এই কুফরকে ইসলামের নামে বিস্তার করে চলেছে। মোটকথা: এই সকল পদক্ষেপগুলো মূলত: ইসলামের সাথে হাসি-ঠাট্টা এবং দ্বীনদারদের সাথে ধোঁকাবাজি করার নামান্তর। আর এই ধোঁকাবজির উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তার মাধ্যমে দ্বীনদার ভাইদেরকে বাতিল জীবনব্যবস্থার প্রতি বিশ্বস্ত ও তাকে সুরক্ষা দানকারী হিসাবে তৈরী করা এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও মন্দকাজ প্রতিরোধকল্পে যে কোন ধরনের গুরুতর আন্দোলন তাদের মাধ্যমে প্রতিহত করা।[2]

[2] র‍্যান্ড কর্পোরেশনঃ একটি আমেরিকান থিংক ট্যাঙ্ক। আমেরিকান প্রশাসনের অধিকাংশ পলিসি এই

সুপ্রিয় সুধীমন্ডলী!

এটাই হচ্ছে প্রকৃত তত্ত্ব। কিন্তু আলোচনাকে সামনে বাড়ানোর প্রয়োজনে...যদি আমরা মেনেও নিই যে, তা দ্বীনদার ভাইদের জিতের ফিরিস্তি। তাহলে প্রশ্ন হলো: এই জিতের ফিরিস্তি কি আপনাদেরকে রাজনৈতিক নির্বাচন দিয়েছে? আপনারা অধিক ভোট পেয়েছেন বলেই কি সংবিধানে এই ধারাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে? নাকি বিষয়টি সম্পূর্ণ তার উল্টো?! প্রকৃত বাস্তবতা হলো: এই নামমাত্র পরিবর্তনও আপনারা তখনই করতে পেরেছেন, যখন আপনারা জনগণকে 'নাহি আনিল মুনকার' তথা মন্দকাজের প্রতিরোধ শিরোনাম দিয়ে রাস্তায় নামাতে পেরেছেন। তারা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার খাতিরে গুলি ও লাঠিচার্জ এবং সরকারের পথে বাঁধা হয়ে

প্রতিষ্ঠানের পরামর্শের অধীনে বাস্তবায়িত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর এই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট ছিল মুসলিম বিশ্বের স্বাধীনতা লাভের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানো এবং সেখানে নিজেদের প্রভু দ্বীনের দুশমন শ্রেণীর লোকদেরকে ক্ষমতায় রাখা। এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর বিশটি বই ও রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। তার মধ্যে একটি হলো: Civil Democratic Islam , যা ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সনাতন ইসলাম আমাদের নিকট গ্রহনযোগ্য নয়, বরং সনাতন ইসলামকে আমাদের অভিলাষ অনুযায়ী "গণতান্ত্রিক ইসলামে" পরিবর্তন করে দেয়া জরুরী। এই বইয়ের ইয়াহুদী লেখক মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার দাবির ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত করে বলেন যে, তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে? তারপর উত্তর প্রদানের নিমিত্তে পাকিস্তানের উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন: কিভাবে সেখানে দ্বীনি দলগুলো এবং জনগণের চোখে ধুলো দেওয়া হয়েছে? আরো বলেন যে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে "মূলভিত্তি" বিদ্যমান রয়েছে এবং এখানকার জনগণও ইসলামকে মহব্বত করেন। এমতাবস্থায় যদি শরয়ী আইন-কানুনকে পূর্ণাঙ্গরূপে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে দ্বীনি দলগুলো আমাদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি এখানে শরয়ী সকল আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় (আমেরিকা ও পশ্চিমারা) এটা কখনোই গ্রহন করে নিবে না। লেখক বলেন: তাই এখানে এর সহজ সমাধান হলো-শরীয়তের কতক আইন-কানুনকে দেশীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, কিন্তু বাস্তবে তার উপর আমল কখনো হবে না।(বিস্তারিত দেখুন এই বইয়ের ৮১ নং পৃষ্ঠায়) বিষয়টি যেন এমন হলো যে, এর দ্বারা দ্বীনদারদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে, অন্যদিকে দ্বীনের দুশমনরাও অসন্তুষ্ট হবে না।

দাঁড়িয়েছে। এই বিজয়াবলি লাভের কারণ এই নয় যে, পার্লামেন্টে আপনাদের ডিজিটাল শক্তি বেশী ছিল, বরং পার্লামেন্টের বাহিরে আপনাদের প্রতিবাদ এমন একটি প্রতিরোধ ছিল; যার কারণে শাসকশ্রেণি কয়েকটি জিনিস মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। যখন ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রস্তাবনামূলক দাবি গৃহীত হওয়ার আইন পাশ হয়, তখনকার সময়ে আপনাদের কতটি সিট ছিল? তখন তো আইন পরিষদে আপনাদের শুধু একটি সিট ছিল। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে যখন সংবিধান প্রণিত হয়, তখন তো আপনাদের দলসমূহ সবচেয়ে খারাপ পরাজয়ের শিকার হয়েছিল। সেই সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়ত প্রতিষ্ঠার নামে আপনারা মন্দকাজ থেকে বাঁধাপ্রদানের যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সেই আন্দোলনের ভীতির কারণেই সংবিধানে ইসলামী ধারাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল...আর এই ধারাগুলো কাদের হাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল? কে ১৯৭৩ সালের এই তথাকথিত ইসলামী সংবিধানকে পাশ করেছিলেন? এই ধোঁকাবাজির "সৌভাগ্য" প্রধানমন্ত্রী ও তার দলের অর্জিত হয়েছে, যার দ্বীন বিদ্বেষ ও ছল-ছাতুরীর উপর আপনারা সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

এমনিভাবে কাদিয়ানীদেরকে যখন কাফির বলে ঘোষণা করা হয়, তখন পার্লামেন্টে আপনাদের কতটি সিট ছিল? তখন নামকা ওয়াস্তে আপনাদের কিছু সিট ছিল। কিন্তু আপনাদের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। এসেম্বলির ভিতরে আপনাদের থেকে ভিন্ন মতাদর্শিক এবং রাজনৈতিক বিরোধীরাও আপনাদের জন্য ভোট প্রদান করে। এখন বলুন তো! কেন এই বিরোধীরা আপনাদেরকে সমর্থন করেছিল? কেন আপনাদের সামনে তারা হাঁটু গেড়ে ছিল? তাহলে শুনুন- তারা "খতমে নবুওয়াত" আন্দোলনের কারণে হাঁটু গেড়েছিল। "খতমে

নবুওয়াতের" আন্দোলন কোন ব্যালেট বক্সের আন্দোলন ছিল না। তা ছিল না ছোট বক্সে কাগজ ফেলানোর কোন কারিশমা বরং তা ছিল মন্দকাজ থেকে বাঁধা প্রদান করার আন্দোলন। আর তা এমন একটি আন্দোলন ছিল; যেখানে সাধারণ জনগণ কুরবানী দিয়েছেন, রক্তের নযরানা পেশ করেছেন এবং প্রতিদিন কয়েকজন মুসলমান শহীদ হয়েছেন।

অন্যদিকে তার বিপরীত চিত্র দেখুন! আপনাদের এমন একটা সময় এসেছিল, যখন আপনাদের নিকট নিজেদের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সিট ছিল। ২০০২ সালের নির্বাচনে আপনারা জাতীয় পরিষদের 63 টি আসন পেয়েছেন। সীমান্তে সম্পূর্ণরূপে আপনাদের সরকার ছিল এবং বেলুচিস্তান সরকার আপনাদের অবদান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এটা এমন একটা বিজয় ছিল, যা ইতিপূর্বে কখনো অর্জিত হয়নি এবং ভবিষ্যতে অর্জিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এখন বলুন! সেই সময় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আপনারা কি কোন অগ্রগতি করতে পেরেছিলেন ? আপনারা কি আইনী ও সাংবিধানিক সংস্কার করতে পেরেছিলেন?!

আসলে সত্য কথা হলো: আপনাদের এই সাফল্য অর্জিত হওয়ার মূল কারণ ছিল আফগানিস্তানের উপর আমেরিকার আক্রমণ ও ইমারতে ইসলামী আফগানিস্তানের পতন। সাধারণ জনগণ প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করতে ছিল, সীমান্ত, উপজাতীয় ও বেলুচিস্তানের জনগণের হৃদয়ে চোট ও রাগ ছিল, এমতাবস্থায় জেনারেলদের জন্য পাকিস্তানের ভূমিতে আমেরিকার গোলামী করাটা কোন সহজ ব্যাপার ছিল না। তজ্জন্য এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভকে থামানো জরুরী ছিল। আবার এই সময়ের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে তালেবানদের পদ্ধতিতে

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। আর সাধারণ জনগণও এই শ্লোগানের উপর ভিত্তি করে আপনাদেরকে সমর্থন করে।[3] কিন্তু যখন আপনারা ক্ষমতার মহলে পৌঁছেছেন, তখন প্রতিবাদ

[3] পাকিস্তানের যৌথ পরিষদের শীর্ষ অধিবেশনে কিছু বিষয়ে সবাই ঐক্যমতে পৌঁছানোর পর অবিলম্বে (নির্বাচনের আগে) একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। সেখানে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, যৌথ পরিষদ ক্ষমতায় আসার পর ইমরাতে ইসলামী আফগানিস্তান(তালেবান)-এর নীতি অনুসারে সরকার সকল ধরনের আইন পাশ করবে:

ঘোষণাপত্রের অনুবাদ:

যৌথ পরিষদের শীর্ষ অধিবেশনের ঘোষণাপত্রঃ

তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর শনিবার ২০০২ ইং। স্থান: ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

পাকিস্তানের ছয়টি দ্বীনি দলের শীর্ষ অধিবেশন, নিজেদের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করছে যে, আমরা পাকিস্তানের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব এবং ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যৌথভাবে নিরলস চেষ্টা করে যাব। আমাদের আসল টার্গেট হলো: রাষ্ট্রের মাঝে প্রকৃত ইসলামের শরয়ী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করা, যা খেলাফতে রাশেদার রীতি-নীতি অনুসারে সম্ভরপর হতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জনগণের আইন-কানুনের ভিত্তি হানাফী মাযহাব অনুসারে হবে। আমিরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি., আমিরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদুনা হযরত উমর রাযি., আমিরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদুনা হযরত উসমান রাযি., আমিরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদুনা হযরত আলী রাযি., আমিরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদুনা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাযি. এবং কনস্টানটিনোপল (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের ইজ্জত-সম্মান ও আনুগত্যের আকিদার ভিত্তিতে নেককার লোকদের ক্ষমতায় গমনের পথকে সুগম করা এবং এর জন্য আইন রচনা করা। এই অধিবেশন আরো ঘোষণা করছে যে, ১৯৭৩ সালের আইন ইসলামের আসল ভিত্তির উপর সংসদীয় গণতন্ত্র এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ার জন্য জিম্মাদার। সংবিধান বহাল রাখা ও তার ধাঁচে কুরআন ও সুন্নাহর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী এবং ইসলামিক গবেষণা কাউন্সিলের প্রস্তাবনার আলোকে এমন একটি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা আমাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার আসল লক্ষ-উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মানযিলে মাকসুদ; যা সাধারণ জনগণের স্বাধীনতা, দ্বীনি সুসমাচার, জাতীয় কৃষ্টি-কালচার ও সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনীতির সুষম বন্টন এবং স্বচ্ছলতায় ভরপুর জীবনের জামানত/গ্যারান্টি দিবে।

নিচে উল্লেখিত ছয়টি দ্বীনি দল " যৌথ পরিষদ"-এর মেম্বার হিসাবে দ্বীনি ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গরূপে নিজেদের মতৈক্যতা প্রকাশ করছে এবং এই বিষয়ের ঘোষণা প্রদান করছে যে, কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের জাতীয় অবস্থান-ই হবে আসল মূলনীতি। কিন্তু পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র

আর প্রতিবাদ হিসাবে বাকি ছিল না। এই পাঁচ বছরে সরকার ও সেনাবাহিনী সবচেয়ে খারাপ অপরাধগুলি করেছে। যে পার্লামেন্টে তখন আপনারা একটি বড় সংখ্যা ছিলেন, সেই সময়ে নারী অধিকারের নামে সেই বিলটি পাস হয়, যাকে আপনারা নিজেরা "যিনা বিল" বলে নামকরণ করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে সম্মতিসহ যিনার অনুশীলন করা কোন আইনি অপরাধ হিসাবে বাকি থাকেনি। এই সময়ে দুর্বৃত্ততা, অনৈতিকতা, ধর্ম বিদ্বেষ গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়; উদারতাবাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দেদীপ্যমান প্রদর্শনীর নামে ক্ষমতার পূজায় লিপ্ত হয়। পাকিস্তান

আফগানিস্তানের তালেবানের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল হিসাবে খেলছে। 'যৌথ পরিষদ" ক্ষমতায় আসার পর তালেবান সরকারের শাসননীতিকে পাকিস্তানের সকল পর্যায়ে জারি করার জন্য সকল মাধ্যম ও উসীলাগুলোকে গ্রহন করবে এবং পুরো পাকিস্তান তাওহীদের অতি উজ্জ্বল ছায়ানীড়ে পরিণত হবে।

স্বাক্ষরঃ

১. কাজী হুসাইন আহমাদ
আমীর, জামা'আতে ইসলামী পাকিস্তান।

২. মাওলানা শাহ আহমাদ নূরানী
সদর, জমিয়ত উলামায়ে পাকিস্তান।

৩. মাওলানা ফজলুর রহমান।
আমীর, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম।

৪. মাওলানা সামিউল হক
আমীর, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান।

৫. আল্লামা সৈয়দ সাজিদ আলী নকভী
পৃষ্টপোষক, তাহরীকে জাফরিয়া পাকিস্তান।

৬. অধ্যাপক সাজিদ মীর
আমীর, জমিয়তে আহলে হাদীস।

সেনাবাহিনী আমেরিকার হুকুমের গোলামে পরিণত হয়। এখানে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ শহরে সি,আই এসে কেন্দ্র স্থাপন করা শুরু করে দেয়। প্রত্যেক শহরে শহরে আমেরিকানদের হাতে দ্বীনদার ভাইয়েরা গ্রেফতার হতে থাকে। পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানের উপর ৫৭ হাজার বার বিমান হামলা করা হয়। জিহাদের নুসরত করার অপরাধে স্থানীয় মুসলমানদের উপর বোমা ও বারুদের গুলিবৃষ্টি বর্ষণ করা শুরু হয়। ন্যাটোর সামরিক যান আমাদের রাস্তা দিয়ে আমাদের নিরাপত্তার মাধ্যমে আফগানিস্তানে যাওয়া শুরু করে। লাল মসজিদের লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে; যাতে আমাদের বোনদের ও মেয়েদেরকে ফসফরাস বোমা দ্বারা পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু আপনারা এই সকল ক্ষেত্রে কি কোন ধরনের বাঁধা তৈরী করতে পেরেছেন? তখন আপনাদের মাঝে সম্পূর্ণরূপে নিরবতা বিরাজমান ছিল কেন?! তার কারণ সুস্পষ্ট। তা হলো: পার্লামেন্টের এই সিটগুলি আপনাদের হাতকড়া এবং পায়ের বেড়ি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। মন্ত্রণালয় ও সিটের কারণে আপনাদের মুখে তালা লেগেছিল। মন্দকে প্রতিহত করা ও বাতিলের সামনে হুংকার দেওয়ার যে ক্ষমতা ছিল, তা প্রথমে আপস-মীমাংসা, তারপর পুনর্মিলন, অবশেষে এটা সহযোগিতায় পরিণত হয়...।

এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের পন্থায় চলার বাস্তবতা। তাছাড়া অন্যান্য আরো অনেক বাস্তবতাও স্পষ্ট করে দেয়। যেমন: গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দ্বীনদার ভাইদের একেবারেই কোন শক্তি-সামর্থ নেই, এটার জানান দেয়। কারণ, গণতান্ত্রিক রাজনীতি শক্তি প্রদান করে না, বরং যে শক্তি ধর্মকে রক্ষা করতে পারে এবং কাফের ও ধর্মের দুশমনদের পথকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারে সে শক্তিকে ছিনিয়ে নেয়। এর বিপরীতে, জনগণকে ভাল কাজের প্রতিরক্ষায় উন্নিত

করা, মন্দপথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানো এবং তাদের আত্মত্যাগের নি:স্বার্থ আবেগের দ্বারা তাদেরকে নিবেদিত রাখা এমন একটি প্রক্রিয়া, যা ধর্মীয় দলগুলোকে কোন সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই ক্ষমতা প্রদান করে থাকে।

প্রিয় উপস্থিতি!

আপনারা পুরো বিশ্বের ইতিহাসের দিকে একটু তাকান! তাহলে আপনারা একটি চরম বাস্তবতা দেখতে পাবেন যে, গণতন্ত্রের ভিতরে ক্ষমতা স্থানান্তর হয় কেবল। যার কারণে ব্যক্তির চেহারা তো পাল্টায়, কিন্তু জোর-জবরদস্তি ও শক্তির উপর নির্ভরশীল পূর্ব থেকে চলে আসা চাপিয়ে দেওয়া সিস্টেমে কখনো কোন পবিরর্তন আসে না। সিস্টেমের পরিবর্তন অর্থাৎ উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সম্পূর্ণ এক নতুন সিস্টেম আনা; যার মাধ্যমে পূর্ব থেকে চেপে বসা শাসকশ্রেনী ও বুদ্ধিজীবিদের থেকে পরিত্রান হাসিল হবে, সেটা ভোটের গণনা দ্বারা কখনো হাসিল হয়নি ও কখনো হতে পারে না। তার জন্য এমন একটি শক্তির দরকার, এমন শক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন; যা বাতিলদের শক্তিকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে দিবে। ইসলামের ইতিহাস আপনার সামনে রয়েছে। সীরাত আমাদের জন্য এক আমলী নমুনা বা আদর্শ। মক্কার মুশরিকরা যখন সত্যের বিরোধিতায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ইসলাম বিজয়ের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু প্রজ্ঞাপূর্ণ মতামত দিয়েই মক্কা বিজয় করেননি। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে মদীনায় শক্তি সঞ্চার করেছেন, ময়দানে বদর ও ময়দানে উহুদের মারহালা অতিক্রম করেছেন, অবশেষে

মক্কা বিজয়ের রাস্তা সুগম হয়েছে, যার মাধ্যমে সকল বাঁধা-বিপত্তি দূর হয়ে যায় এবং মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ!

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে এই নিয়ম চলে আসছে যে, বিপরীত শক্তির মোকাবিলা শক্তির দ্বারাই করতে হয়। মহান রাব্বুল আলামীনও তাঁর সৃষ্টজগত চালানোর জন্য এই নিয়মই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এই নিয়ম মুসলিম ও কাফির সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তাছাড়া কুফুরী বিশ্বে যেসব বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তারও মৌলিক কারণ হচ্ছে এটা। আর এটা কখনো সাধারণ চিন্তা-ভাবনা বা শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম করার দ্বারা অর্জিত হয়নি। বরং চিন্তা-ভাবনা করার সাথে সাথে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে, তখনিই গিয়ে সকল বাঁধা-বিপত্তি দূর হয়েছে এবং পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফান্সের বিপ্লবের দিকে একটু লক্ষ্য করুন! এটা হচ্ছে সেই বিপ্লব যার মাধ্যমে সেখানে গণতন্ত্র সিস্টেম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক সিস্টেমও কি ভোটের গণনা দ্বারা আনা হয়েছিল? অহিংস নীতির কারণে কি এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল? না, কক্ষনো না। বরং চেপে বসা শাসকশ্রেণীর সাথে সংঘাতে যেতে হয়েছে, জীবন দিতে হয়েছে, তখন গিয়ে কোথাও কোন নতুন সিস্টেম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছে। আমাদের আশে পাশে রাফেযী বিপ্লবের ইতিহাসও আপনাদের সামনে রয়েছে। সেখানেও ভোটের গণনা দ্বারা পুরোনো সিস্টেম রহিত হয়ে যায়নি, বরং তা শক্তিমত্তার বহির্প্রকাশ ছিল। পাশাপাশি তা একটি বিপ্লব ছিল, ফলশ্রুতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

যদি আমাদের পাকিস্তানী সিস্টেমটি অস্তিত্ব লাভ করে থাকে, তবে তা এখানে ১৯47 সালের ভোট গণনা করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আসল কথা হচ্ছে: ১৯৪৭ সালে সিস্টেম একটুও পাল্টায়নি বরং পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত সিস্টেমের মাঝে ক্ষমতার স্থানান্তর হয়েছে মাত্র। যার কারণে চেহারা পাল্টিয়েছে, কিন্তু সিস্টেম আগের সিস্টেম হিসাবেই অক্ষুন্ন রয়েছে। সেনাবাহিনী, শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতি এবং সংবিধানসহ পুরো সিস্টেম ইংরেজদের সিস্টেম হিসাবেই অবশিষ্ট ছিল। নতুন সিস্টেম যদি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে তা ইংরেজরা প্রতিষ্ঠা করেছে। ইংরেজরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভা-সমাবেশ ও শান্তিপূর্ণ উৎসগুলির দ্বারা নিজেদের সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করে নাই। বরং তারা শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে, বন্দুক ও বারুদ দ্বারা নিজেদের রাস্তার সকল বাঁধা-বিপত্তি দূর করেছে। তখন গিয়ে তারা কোন স্থানে কোন সিস্টেম আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পেরেছে। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো: যুক্তি, ইতিহাস ও ইসলামসহ সকল কষ্টিপাথর দ্বারা একথা সম্পূর্ণরূপে ভুল প্রমাণিত হয়েছে যে, শক্তি ও ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কোন বাতিল সিস্টেম বিজয়ী হবে, অতঃপর তা গণতন্ত্রাতিক সংগ্রামের মাধ্যমে পরিবর্তন করে ফেলা হবে! এবং তদস্থলে তার সম্পূর্ণ বিপরীত-উল্টো আসমানের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ন্যায়-ইনসাফের উপর ভিত্তিকৃত ইসলামী সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

এমতাবস্থায় যদি আপনার কোন হিতাকাঙ্খী আপনাকে বাতিল সিস্টেমের পক্ষ থেকে চিহ্নিত রেখার উপর চলতে প্ররোচিত করে, গণতন্ত্রের সাথেই সংশ্লিষ্ট হওয়ার ও তার প্রতি বিশ্বস্ত

হওয়ার প্রতি প্ররোচিত করে; তাহলে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে চাই যে, এমন হিতাকাঙ্খীরা এই বাতিল সিস্টেমের সম্মান ও বিজয়কে একটি স্বীকৃত বাস্তবতা হিসাবে মেনে নিয়েছে এবং আমাদের শংকা আছে যে, সম্ভবত তাদের অন্তরে ভালকাজের প্রচার এবং মন্দকাজের প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতিও অদ্যবধি বাকি নেই। যদি এই প্রতিশ্রুতি এবং অভিপ্রায় থাকত, তাহলে তার বাস্তবতা স্বীকার করে নিত এবং অন্তর্দৃষ্টি এবং পরিকল্পনা অনুসারে সঠিক পথ গ্রহন করে নিত।

সুপ্রিয় ভাইয়েরা আমার!

তো এখন কথা হলো: এর সমাধান কিসে? শরীয়াহর উদ্দেশ্য কি এবং তার কর্ম প্রদ্ধতি কি হতে পারে? যার উপর আমল করার মাধ্যমে আমরা নিজেরাও বদদ্বীনি থেকে বাঁচতে পারব এবং আমাদের জাতিকেও শরীয়াহর বরকতসমূহের দ্বারা ভরপুর করে দিতে পারব। এই বিষয়ের উপর আগামী পর্বে ও শেষ পর্বে আলোচনা করা হবে, ইনশা আল্লাহ।

وآخر دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِ العالمين. والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.